

আর কারও নয়। -হু.

যদি এটা তোমার হাতে পড়ে, মেঘ ডাকার আগে খুলো না।

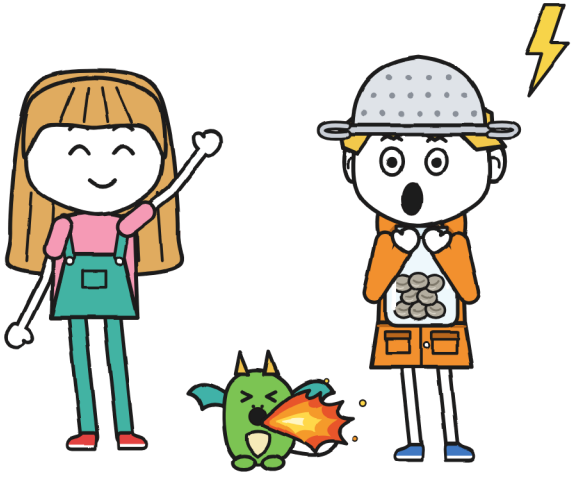


এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে: তুমি এটা কোরো না। কয়েক পাতা জুড়ে থাকলে লেখা থাকে "এখান থেকে" আর "এখান পর্যন্ত"। সত্যিকারের ঝড়ে শেষ পাতাটা দেখো। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ২

মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

Lui Eriksson



সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

অসম্ভব ডেলিভারি · ২
মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

সিরিজের দ্বিতীয় বই। প্রথমটা: “এই পার্সেলটা কামড়ায়”।

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

ফন্ট: Andika, Patrick Hand, Caveat, Courier Prime, Atma, Galada ও Hind Siliguri (SIL OFL লাইসেন্স)।

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় একটা মেঘের ডাকও চোট পায়নি। -হু.



অধ্যায় ১

ঝড়-শিকারি

উল্টোদিকের দোকানে একটা পার্সেল কাঁপছে।

গত শনিবার ওটা একবারই নড়েছিল। তারপর থেকে আর থামেনি: একটানা মিহি কাঁপুনি, পশুচিকিৎসকের অপেক্ষা-ঘরে বসা ছোট্ট কুকুরের মতো। সাত দিন ধরে এমন চলছে। প্রতিদিন একটু একটু বেশি।

আর আমার একটা নতুন খাতা আছে।

১ নম্বর খাতাটা আমার শেষ হয়ে গেছে। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক মারা আমাকে এটা দিয়েছেন: নীল মলাট, আর এক কোণে দোকানের লাল সিলমোহর। প্রথম পাতায় আমি নামটা লিখলাম, একটা নতুন শব্দ জুড়ে:

ডেলিভারির খাতা ২ · গুনির। অফিশিয়াল।

"অফিশিয়াল" মানে আগে আমি পড়ব। অফিশিয়ালি। –হু.

মারা বলেন, অফিশিয়াল খাতায় আঁকাআঁকি করতে নেই। দেখা যাক: এটায় এর মধ্যেই একটা ছবি আছে।

আগের খাতা নিয়ে যেটুকু জানা দরকার: দুই শনিবার আগে হুলিতা (সবুজ নোটগুলোর হুলিতা) আর আমি রাতে, সাঁকো দিয়ে, কোনো বড় ছাড়া, এমন একটা ডিম পৌঁছে দিয়েছিলাম, যেটা বছরের পর বছর কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি। এখন সেটা

টুকরো, ড্রাগনের এক ছানা, যে আমার সবকিছু নকল করে। দোকানের জাদুকরী মারা আমাদের শাস্তি দিয়েছেন: প্রতি শনিবার ওখানে, সকাল দশটায়। আমি পাড়ায় নতুন, আর আমার প্রায় সবকিছু এখনও বাক্সে।

যেটা কাঁপছে সেটা ২ নম্বর। ওটা ফেরত পার্সেলের তাকে আছে, আর ওর গায়ে এমন একটা লেবেল, যা আমার মুখস্থ: এই সপ্তাহে প্রতি বিকেলে ওটা পড়েছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, না ছুঁয়ে, আর মারা এমন ভান করেছেন যেন আমাকে দেখতেই পাচ্ছেন না:

- নং ২ · ভঙ্গুর।
- গন্তব্য: ফ্লোরা, ৯, খাল রোড।
- নির্দেশ: মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না।
- প্রেরক: র.

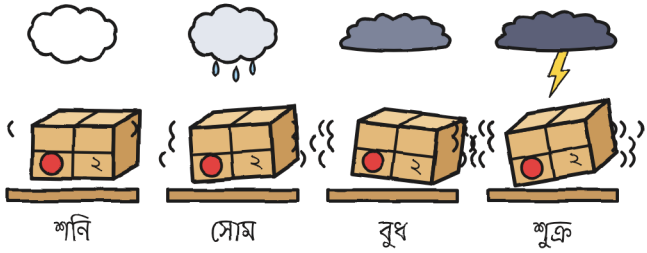
চারপাশে তেইশটা “ফেরত” সিলমোহর। আমি দুবার গুনলাম, যদি কোনোটা খসে পড়ে থাকে।

ফেরত পার্সেল হলো এমন পার্সেল, যা কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি: যে নেয়, সে যদি ওটায় মোছে না এমন কালিতে সই না করে, তাহলে ভোর হলে ওটা উড়ে নিজের তাকে ফিরে যায়, সারি বেঁধে, হাঁসের মতো। বাকি আছে উনিশটা: দেয়ালে সেটা লেখা, সবুজ কালিতে, হুলিতার হাতের লেখায়, আর হুলিতা সবুজ কালিতে যা লেখে তা মোছে না। সবগুলো পাঠান একই মানুষ, র.; ওঁর সম্পর্কে শুধু এটুকু জানা যায় যে ওঁর হাতের লেখা ভীষণ খারাপ।

প্রতি বিকেলে আমি টুকে রাখতাম ওটা কতটা কাঁপছে আর আবহাওয়া কেমন: এভাবেই তৈরি হলো ২ নম্বরের কাঁপুনি-মিটার। শুক্রবার মেঘের ভেতরে একটা বাজ ছিল।

ভয়ে কাঁপছে না: ঝড় আসছে বলে কাঁপছে। শনিবার, বিকেল ছয়টায়। আবহাওয়ার খবরে আমি ছয়বার দেখে নিয়েছি। -হু.

কাঁপুনি-মিটার
নং ২-এর



নোটটা আমি দুবার পড়লাম। দ্বিতীয়বার, শুধু ছটার অংশটা।



শনিবার সকাল দশটায় মারা (বেগুনি টুপি, আর এমন সিলমোহর, যা থেকে নিভে যাওয়া মোমের গন্ধওয়ালা ফুলকি ছোটে) কাউন্টারের পেছনে ২ নম্বর পার্সেলটা হাতে নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাকে নয়: হাতে। সিলমোহরের পাশে তখনও রাবারের ব্যাণ্ডটা ছিল, কারও না থাকার পর থেকে যেটা আমার। আর বিজলির ডেলিভারি-বয় তোনিও দাঁড়িয়ে ছিল, হেলমেট মাথায়: শনিবারগুলো ওর শাস্তিও, আর তোনিও শাস্তি কাটে ঠিক যেভাবে ডেলিভারি করে, সময়মতো আর কিছু না খুলে।

"তেইশ বার আমি নিজে এটা পৌঁছে দিতে গেছি," মারা বললেন। "আর একবারও ঝড়ের মধ্যে নয়।"

মারা লেবেলটার ওপর বুড়ো আঙুল বুলিয়ে নিলেন। আমি দোকানের কাচের জানালার দিকে তাকালাম, যেটা ক্রমেই ধূসর হচ্ছিল: আজকের যাত্রাটা অন্যদিনের মতো হবে না।

"এটা," মারা ঘোষণা করলেন, "তোমরা পৌঁছে দেবে। আজ বিকেলে।"

হুলিতা এমন এক লাফ দিল যে প্রায় "বাকি ১৯" লেখা সাইনবোর্ডটা ছুঁয়ে ফেলল, আর নামতে নামতেই কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিল। আমি লাফালাম না: দুটো কথা

আমার ভেতরে আটকে রইল, “আজ বিকেলে”, আর একটা সময়, ছটা, যেগুলো পার্সেলটার চেয়েও ভারী লাগছিল।



মারা তিনটে শর্ত দিলেন, আঙুলে গুনে গুনে:

১. পাঁচটায় রওনা দেবে, ঝড় আসার আগে, আর ঝড় না থামা পর্যন্ত ফ্লোরার বাড়িতে থাকবে।
২. তোমাদের বাড়ির লোকেরা জানে, ফ্লোরাও জানেন।
৩. নিয়মটা লেবেলেরই: মেঘ ডাকার আগে খোলা যাবে না। আর সেটা হতে হবে মাথার ওপরের ডাক: দূরের ডাক ধরা হবে না।

চালাকিটা আমি চিনে ফেললাম: এগুলো প্রায় হুবহু ভেরার বকুনির নিয়ম, ভেরা টুকরোর মালকিন, কিন্তু বলা হলো আগে, পরে নয়। মারা বকুনির সময় ছিলেন না, তবু জেনে গেছেন: এই পাড়ায় বকুনি পার্সেলের আগে পৌঁছে যায়।

“আর তুমি যাচ্ছ না?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

“এখানে আমার কাজ আছে,” মারা বললেন, আর কাচের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, যেটা ধূসর হয়ে আসছিল।

কাউন্টারের শেষ মাথায় ভাঁজ করা একটা কম্বল ছিল, এক জোড়া স্কি করার কানঢাকা আর একটা সসপ্যান। আমি সবই দেখলাম। আমি পার্সেলটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর হুলিতা আমার দিকে তাকাল।

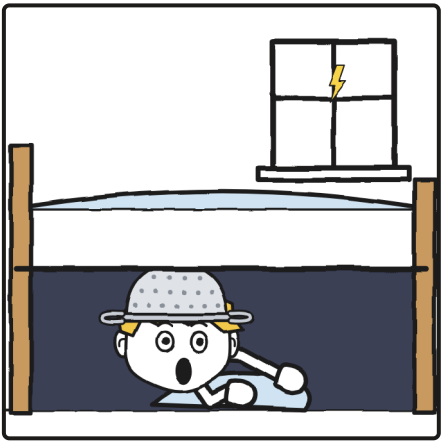
“তোমার ঝড় ভালো লাগে?”

প্রশ্নটা ও করল আমার চোখে চোখ রেখে। আমি সত্যিটা বলতে পারতাম। বললাম এটা:

“খুব ভালো লাগে। আমার আগের পাড়ায় আমি প্রফেশনাল ঝড়-শিকারি ছিলাম।”

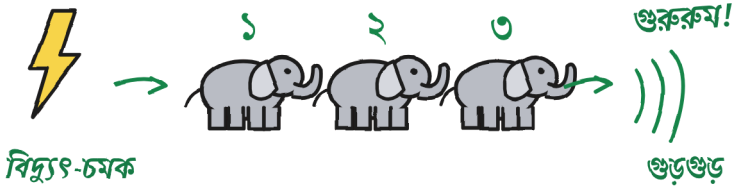
আগের খাতায় একটা মিথ্যে ফিরে আসতে একটা দিন আর একটা রাত লেগেছিল। এবার ঠিক করলাম পথটা ছোট করে দেব: মিথ্যেটা আমি সেদিন সকালেই এঁকে ফেললাম, আর পাশের খোপে সত্যিটা।





ছাঁকনিটা ছিল রান্নাঘরের, স্টিলের, দুটো হাতলওয়ালা। ওটা বাজ থামায় না। আমার শুধু মাথার ওপর কিছু একটা থাকলে সুবিধে হয়। এখন ওটা বাড়ি বদলের কোনো একটা বাক্সে পড়ে আছে, সেই কাঁচিগুলোর পাশে, যেগুলো মা এক সপ্তাহ ধরে খুঁজছে।

হুলিতা আমাকে শেখাল কীভাবে ঝড় গুনতে হয়, আমার খাতায়, অনুমতি না নিয়ে আর সবুজ কালিতে।



এক হাতি, দুই হাতি, তিন হাতি...

১ হাতি = ১ সেকেন্ড

৩ হাতি = ১ কিলোমিটার (মোটামুটি)

০ হাতি = ঠিক মাথার ওপর!

↖ ওটাই লেবেলের মেঘের ডাক।
দূরের ডাক পার্সেল খোলে না।

আরও হাতি: ওই বাজ আরও দূরে পড়েছে।

মেঘের ডাক শুনলে, দূরের হলেও: নিরাপদ জায়গায় চলো!

গোনা হয় বিদ্যুৎ-চমক থেকে মেঘের ডাক পর্যন্ত, হাতিতে: “এক হাতি” মোটামুটি এক সেকেন্ড, আর প্রতি তিনটেয় এক কিলোমিটার। এভাবে মোটামুটি বোঝা যায় ওই বাজটা কত দূরে পড়েছে; পরেরটা কোথায় পড়বে, তা বোঝা যায় না। আর গোনা এটাও বলে না কখন বাইরে বেরোনো যাবে, আর সেটা, হুলিতার মতে, আলাদা একটা নিয়ম, ছবি ছাড়া: শেষ মেঘের ডাকের আধ ঘণ্টা পরে।

আমি মনে মনে চেষ্টা করে দেখলাম, আর আমার হাতিরা বেরোল ভীষণ তাড়াতাড়ি, যেগুলো কোনো কাজে লাগে না। আমার কিছু গোনার দরকার ছিল না, কারণ ঝড় আমার খুব ভালো লাগে, তবু লিখে রাখলাম, যদি কাজে লাগে।

তোনিও আমার কাঁধের ওপর দিয়ে লেবেলটা পড়ল, যেভাবে ও নিজের নয় এমন সবকিছু পড়ে।

“বিজলি ঝড়ে ডেলিভারি দেয় না,” ও বলল, আর ওর হলুদ ব্যাগের ছোট অক্ষরের লেখাটা আমাদের দেখাল: বিজলি ডেলিভারি · দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে, আর হুলিতার আতশি কাচে একটা তারা-চিহ্ন: *ঝড় বাদে।

“এখনও তো ঝড় নেই,” হুলিতা বলল।

তোনিও ছোট অক্ষরের লেখাটা আবার পড়ল, যদি “এখনও”-র কথা কিছু থাকে। কিছু ছিল না।

তাই তোনিও আমাদের সঙ্গে এল। ও হাতি গোনে এক ঝটকায়, “একদুইতিন!”, যেন ওগুলো একটা চালান। তোনিওর মতে, সব ঝড়ই এক কিলোমিটার দূরে। জানি না এটা সাহস, না হাতির অভাব।



পাঁচটায় আমি রাস্তা পেরিয়ে বাড়ি গেলাম রেনকোট আনতে; হুলিতা নিচের সদর দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করল। মা ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, হাত থেকে রেনকোটটা ঝুলিয়ে। কমলা রং নিয়ে মায়ের একটা তত্ত্ব আছে: ওটা দূর থেকে দেখা যায়। কোথা থেকে দেখবে বলে মা ভাবছে, তা আমি কখনও জানতে পারিনি।

“কমলা রঙেরটা পরো,” মা বলল। “তুমি ঠিক যেতে চাও? মেঘ ডাকলে তো তুমি...”

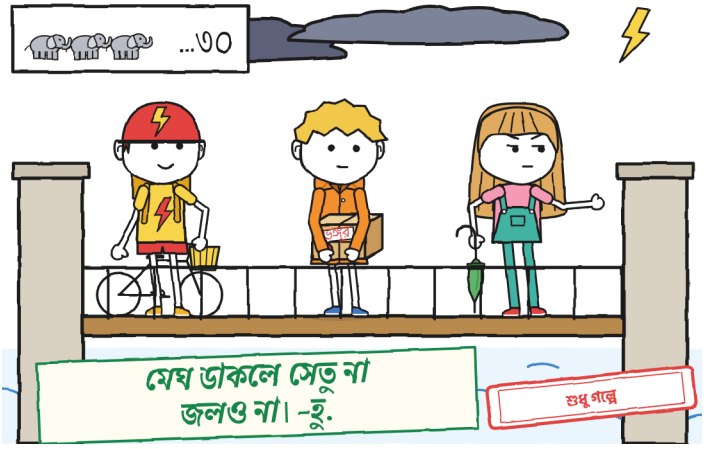
“টা-টা, মা!”

আমি দু ধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে নামলাম। হিসেব করেছিলাম, সিঁড়ির ঘরের প্রতিধ্বনিতে মায়ের কথার অর্ধেকটা পথেই হারিয়ে যাবে। হারাল না। হুলিতা নিচেই ছিল।

"মেঘ ডাকলে তো তুমি..." কী? -হু.

আকাশ ক্রমেই আরও কালো হচ্ছিল, আমরা বড় সেতু পার হলাম। রাতে ওটা তুলে দেওয়া হয় যাতে নৌকা যেতে পারে; দিনে সবাই পার হয়, আর ওই সময়ে পার হচ্ছিলাম শুধু আমরা, আর উল্টোদিকে তাড়াহুড়ো করা এক ভদ্রলোক, ঝড় আসার সময় যেটা ঠিক দিক। আমি ২ নম্বরটা দু হাতে ধরে ছিলাম, একদম সোজা করে। তোনিও সাইকেলটা ঠেলে নিচ্ছিল: বিজলিকে এত আস্তে যেতে আমি আর কখনও দেখিনি, পথ হারানো ছাড়া।

মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় হুলিতা জলের দিকে ওর শুকনো সম্ভাষণটা জানাল, হাত তুলে, ছোট করে, হাসি ছাড়া, যেন এমন কাউকে, যাকে ও পছন্দ করে না। সাঁকোর সেই রাত থেকে ও এটা করে। আমার মনে হয় এটাই চুক্তি: ও সম্ভাষণ জানায়, আর জল ওকে যেতে দেয়।



অনেক দূরে আকাশ জ্বলে উঠল।

মেঘের আড়ালে সেটা ছিল এক পলকের ঝিলিক, শব্দহীন, যেন কেউ এমন একটা ঘরের আলো জ্বালছে আর নেভাচ্ছে, যেখানে তুমি নেই। হুলিতা থমকে দাঁড়াল আর চোখ বুজে নিচু গলায় হাতি গুনল। কিছু শোনার আগে ও তিরিশ গুনল। আমি ওর সঙ্গে মনে মনে গুনলাম, আমার সেই ভীষণ তাড়াতাড়ির হাতিদের নিয়ে, আর আমার হলো বিয়াল্লিশ।

গুরুরুম।

"ওই বাজ পর্যন্ত প্রায় দশ কিলোমিটার," ও হিসেব করল। "আবহাওয়ার খবর বলছে, ঝড় আসবে ছটায়।"

"মেঘ ডেকেছে!" তোনিও চেঁচিয়ে উঠল। "এবার খোলা যায়?"

"পার্সেল খোলার জন্য ওটা ধরা হয় না," হুলিতা চোখ না খুলেই বলল। "ওটা দশ কিলোমিটার দূরে; লেবেলের ডাক হলো মাথার ওপরেরটা: শূন্য হাতি। কিন্তু শোনা তো যাচ্ছে: নিরাপদ জায়গায় চলো! দৌড়াও!"

আমি খাল রোড পর্যন্ত দৌড়ালাম, এমন ভান করে যেন কিছুই শুনিনি। না গুরুরুম, না ছটার কথা।

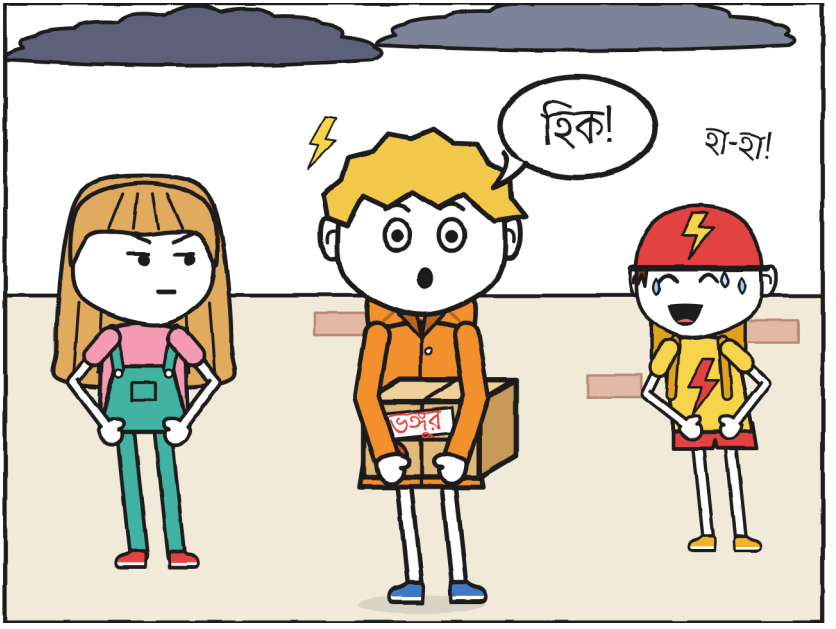
"ওটা কি হিক ছিল?" হুলিতা গতি না কমিয়েই জিজ্ঞেস করল।

"না," আমি বললাম। "হিক!"

তোনিও সাইকেলের হ্যান্ডেলের ওপর ভেঙে পড়ে এত হাসল যে সাইকেলটা একদিকে কাত হয়ে গেল। হুলিতা হাসল না। ও চোখ ছোট করে তাকাল, যেভাবে এমন কিছু পড়ার সময় তাকায়, যা লেখা নেই।

একটা মেঘের ডাক, একটা হিক: ছোটবেলা থেকেই আমার এটা হয়। ঝড় দূরে থাকলে ওটা একটাতেই থেমে যায়; মাথার ওপর থাকলে আরেকটা আসে, আর আরেকটা, তিন সেকেন্ড পরপর, যতক্ষণ না ঝড় চলে যায়। এটা ভয় নয়। এটা এমন কিছু, যা আমার শরীর আমাকে না জিজ্ঞেস করেই করে, বড় হওয়া বা হাঁচির মতো,

আর বড় হওয়ার মতোই, মুখে কোনো ভাব ফুটিয়ে এটা থামানো যায় না। আমি জানি, কারণ সব রকম মুখ করে দেখেছি।



এটার নাম ভয়। -হু.

খাল রোডে ভেরা, লাল চুলের ভেরা, ড্রাগনদের বাড়ির দরজায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যেটা ফ্লোরার দরজার গায়ে লাগানো, টুকরোকে কোলে নিয়ে। টুকরো আমাকে দেখামাত্র আমার মুখ করল: ও সবসময় এমন করে, এক সেকেন্ড আমার দিকে তাকায়, দেখে নেয় আমার কী মুখ, আর নিজেও সেটাই পরে নেয়।

আমি ২ নম্বরটা তোনিওর সাইকেলের ঝুড়িতে রাখলাম আর দু হাত বাড়িয়ে দিলাম।

"এটা ওর প্রথম ঝড়," ভেরা বললেন, আর ওকে আমার হাতে দিয়ে দিলেন। "ও তোমার সবকিছু নকল করে, শুনি। যা তুমি অনুভব করো, তা-ও। আর ভয় পেলে ওকে

টানাটানি কোরো না: ও আঁকড়ে ধরে। সব থামলে ফ্লোরার উঠোনের পাঁচিলে তিনটে টোকা দিয়ো, আমি এসে ওকে নিয়ে যাব।”

“আমি কিছুই অনুভব করছি না,” আমি জবাব দিলাম। “ঝড় আমার খুব ভালো লাগে।”

কথাটা আমি বুক ফুলিয়ে বললাম, আর আমার কোলে টুকরোও ঘাড় লম্বা করে ঠিক তেমনই বুক ফোলাল: ঝড় যার খুব ভালো লাগে, তার জীবন্ত ছবি, দুই মাপে। ভেরা আমাদের দুজনের দিকে তাকালেন, একজন আরেকজনের ওপর, একই মুখে, আর কিছু বললেন না। ভেরা কথা জমিয়ে রাখেন সেই সময়ের জন্য, যখন দরকার পড়বে।

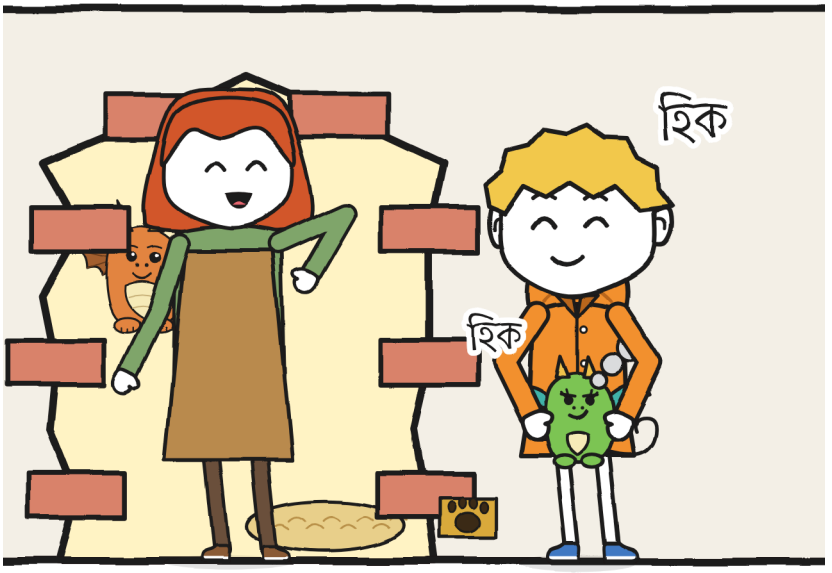
দূরে মেঘ ডাকল। আমার হিক উঠল। টুকরোরও হিক উঠল, আর ওর নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরোল।

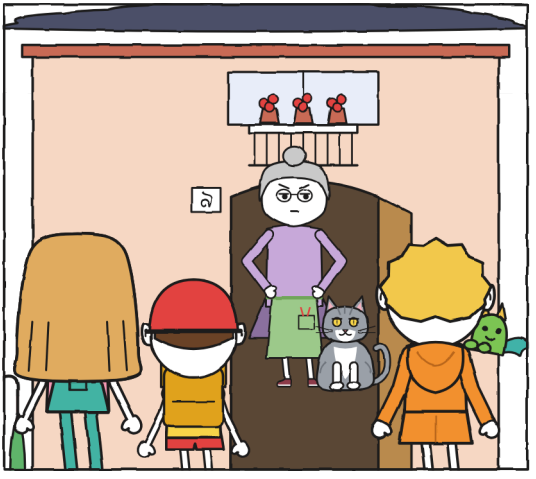
“ভেতরে, এক্ষুনি,” ভেরা থামিয়ে দিলেন, আর আমাদের ফ্লোরার দরজার দিকে ঠেলে দিলেন।

ফ্লোরার বাড়ি হলো জেরানিয়ামওয়ালা বাড়িটা, সেই বারান্দার, যেখান থেকে দুই শনিবার আগে এক ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন, ঝারিটা শূন্যে ধরে।

উনি আমরা কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে দিলেন: পাকা চুলের খোঁপা আর চশমা পরা এক ভদ্রমহিলা, গায়ে পকেটে ভরা সবুজ মালির এপ্রন, আর পায়ের মাঝখানে বুকে সাদা ছোপওয়ালা এক ধূসর বেড়াল, যে আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমরা এমন এক পার্সেল, যা ওর জন্য নয়। উনি বাক্সটার দিকে তাকালেন। আকাশের দিকে তাকালেন। টুকরোর দিকে তাকালেন। এই ক্রমে, আর প্রতিটার জন্য সমান সময় দিলেন, যা বেশি ছিল না।

“ভেরার ছানা। আমার ফার্নগুলো যেন পুড়িয়ে না দেয়,” উনি বললেন। “ভেতরে এসো, বৃষ্টি আসছে। তবে বলে রাখছি: আমি পাথরে সই করি না।”


হিক
হিক



একটা গল্প, ছয় সাইজ

এই বইটা ছয়টা সাইজে আছে, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ২০টিরও বেশি ভাষায়। XXS, XS, S, M আর L একই ছবি নিয়ে পাতায় পাতায় গল্পটা বলে, প্রতিবার আরও একটু সূক্ষ্মতা নিয়ে; XL হলো উপন্যাস: একই গল্প, যেখানে গুনি যা ভাবে অথচ বলে না, তার সবকিছুর জন্য জায়গা আছে।

CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক: XXS, pre-A1 · XS, A1 · S, A2 · M, B1 · L, B2 · XL, B2–C1।

যে যার সাইজে। একই ঝড়। -হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য



linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো (L সাইজের অ্যাক্টিভিটিসহ)